ঢাকা শুক্রবার, ১৫ ডিসেম্বর ২০০০
১ পৌষ ১৪০৭, বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪১

প্রথম আলো

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা

পুরো প্রক্রিয়াটি দ্রুত সম্পূর্ণ হোক

প্রায় দুবছর আগে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় নিম্ন আদালতে প্রদত্ত রায়ের ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গতকাল একটি দ্বিধাবিভক্ত রায় দিয়েছে। দুজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের একজন নিম্ন আদালতের রায়, অর্থাৎ ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন। অন্যজন পাঁচজন আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়ে বাকি ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন। পাঁচজন আসামির ব্যাপারে দুই বিচারকের রায় দ্বিধাবিভক্ত হওয়ায় বিষয়টি এখন প্রধান বিচারপতির কাছে যাবে। প্রধান বিচারপতি বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য একটি নতুন বেঞ্চ গঠন করতে পারেন। হাইকোর্টের রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পরে আসামিরা আবার হাইকোর্টের আপিল বিভাগে যেতে পারবেন।

আজ থেকে ২৫ বছর আগে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার পরিবারের প্রায় সকল সদস্যসহ নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এমন নির্মম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নজির বেশি নেই। অন্ততপক্ষে এই দিক থেকে এটা একটা নজিরবিহীন হত্যাকাণ্ড যে, হত্যাকারীদের বিচার থেকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত হয়েছিল ইনডেমনিটি আইন। মানবাধিকার বিরোধী সেই আইন দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বলবৎ রেখে পূর্ববর্তী সরকারগুলো আইনের শাসনের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এসেছে, তার গ্লানি থেকে জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্রীয় অন্যতম নীতি ন্যায়বিচারকে যেভাবে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের জন্য বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার আইনগত প্রক্রিয়ার সবকটি ধাপ অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হবে। এটা আমাদের আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগতির লক্ষণ বৈকি। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারের জন্য কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়নি, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায়, সাধারণ আদালতেই বিচার প্রক্রিয়া চলছে এবং আসামিপক্ষের বক্তব্য প্রকাশ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগে কোনো প্রকার ঘাটতি রাখা হয়নি। আইনের শাসনের সংস্কৃতির বিকাশের জন্য এমন দৃষ্টান্তই প্রয়োজন।

মামলা আদালতের নিজস্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আইনের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় ধাপ অতিক্রান্ত হোক, আমরা ধৈর্য ধারণ করি, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করি। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা সংক্ষিপ্ত বিচারের কথা না ভেবে বরং আইনকে শ্রদ্ধা করে সাধারণ আদালতে বিচারের মধ্যে বিচারকামীদের যে ইতিবাচক মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে তা যেন অটুট থাকে। কেবল এভাবেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হওয়া জরুরি। নিম্ন আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৫ জন আসামির মধ্যে মাত্র চারজন বাংলাদেশের কারাগারে আটক রয়েছে। অবশিষ্ট সবাই দেশের বাইরে পলাতক। যেসব দেশে তারা অবস্থান করছে সেসব দেশের সরকারের প্রতি আমরা আহ্বান জানাব তাদের এ দেশে ফেরত পাঠিয়ে আমাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করবেন।

সীমান্তে চোরাচালান

এই চক্রের হাত থেকে দেশ বাঁচাতে হবে

প্রতিবারের মতো এবারও ঈদের আগে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানের মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে এখন চোরাকারবারিরা প্রায় বিনা বাধায় তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তারা চোরাকারবারিদের কাছ থেকে বখরা নিচ্ছে।

চোরাচালান প্রচুর লাভজনক হওয়ার ফলে এর সঙ্গে প্রশাসনের দুর্নীতিবাজ বড় কর্তা ও অসৎ এবং প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সংযোগ থাকে। একই কারণে পুলিশ বস্তুত চোরাকারবারিদের কাজকে নিষ্কণ্টক করাকেই তাদের 'কর্তব্য' বলে মনে করছে। টোকেন সিস্টেমের আওতায় দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে আসা দ্রব্য 'হালাল' হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর অফিস থেকে পাঠানো রিপোর্টগুলোতে সাধারণভাবে যে কথাটি এসেছে, তা হলো চোরাকারবারি, প্রশাসন, শান্তিরক্ষা বাহিনী, প্রভাবশালীরা মিলে এটা একটা সুসংগঠিত চক্র।

বছরের এ সময়টিতে চোরাচালান সিন্ডিকেট আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মওকা পেয়ে যায়। চোরাচালানিদের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের পকেটও স্ফীত হয়, কিন্তু ক্ষতি হয় দেশের। রাষ্ট্র বঞ্চিত হয় কর থেকে, দেশীয় পণ্য মার খায়। দেশের ক্ষতি করে যারা এই অপকর্ম করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু সরকারের বেতনভুক যাদের ওপর এ দায়িত্বটা রয়েছে, তাদের একটা বিরাট অংশ চোরাকারবারিদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে। আগে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

তাই চোরাচালান সিন্ডিকেট, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, পুলিশসহ যাদের বিরুদ্ধে সীমান্ত খুলে দেওয়া এবং খোলাপথে টোকেন দিয়ে চোরাই মাল 'হালাল' করার নিশ্চিত ব্যবস্থা করে দেওয়ার অভিযোগ আছে, তাদের সবার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে জনগণ ও নাগরিক সমাজকে এ লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে সরকার চোরাচালানিদের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকতে না পারে।

বিজয় দিবসের জয় গাথায় এঁদের নামও উচ্চারিত হওয়া দরকার

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

আজ ইচ্ছা ছিল ঢাকায় 'ইরফান রাজা-প্রহসন' নিয়ে কিছু লিখব। এদিকে আবার হাসিনা সরকার বিলম্বে হলেও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ উদ্যোগ ব্যর্থ করার জন্য কেবল বাইরের বিশেষ মহল নয়, আওয়ামী লীগের ভেতরের একটি মহলও বিশেষভাবে চেষ্টিত। ইচ্ছা ছিল দেশের এই দুটি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়েই বিজয় দিবসের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি লাইন উৎসর্গ করার পর দু'কথা লিখব।

'ক্ষমা যেথা হীন দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।'

এই দুটি লাইন লিখতে গিয়ে মনে পড়ল, আগামীকাল শনিবারই ষোলই ডিসেম্বর। আমাদের সেই বহু প্রার্থিত বিজয় দিবস। বিজয় নেই, দিবসটি তো আছে। এই বিজয় অর্জনের জন্য কত দেশপ্রেমিক বীর অকাতরে আত্মদান করেছেন। বীরের সেই রক্তস্রোতে মিশে আছে অসংখ্য বিদেশীরও রক্ত। তারা ছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মিত্র। তাদের কজনের নাম আমাদের ইতিহাসে লেখা আছে? কজনকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করি?

কথাটা মনে হতেই লেখার বিষয়বস্তু বদলে গেল। ইরফান রাজার মতো এক মর্কট কূটনীতিকের মুখ ভেংচি এবং একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নিয়ে দুদিন পরেও লেখা যাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে মাত্র একদিন পরের ষোলই ডিসেম্বরের বিজয় দিবসটি সামনে নিয়ে যে তিনজন বিদেশী বীরের নাম আমার স্মরণে ভেসে উঠেছে, মনে হলো, তাদের নিয়ে কিছু না লিখলে মুক্তিযুদ্ধের সকল বীরের প্রতিই আমার সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে ঘাটতি থাকবে।

প্রথমই যে বীরের কথা উল্লেখ করব, তার নাম ডব্লিউ এ.এস. ওডারল্যান্ড (Ouderland)। ১৯১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদান ও অসীম সাহসিকতার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' উপাধি দেন। বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাংলাদেশে এই বিরল সম্মানের অধিকারী হন।

আমি এই ওডারল্যান্ডের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার চারটি শহর ঘুরে লন্ডনে ফিরে আসার পর হঠাৎ ক্যানবেরা শহর থেকে কামরুল আহসান খানের টেলিফোন পেলাম। বাংলাদেশের এই বাম যুব নেতা এখন সপরিবারে অস্ট্রেলিয়ায় বাস করেন। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে এখনো তার নাড়ির যোগ। টেলিফোনে কামরুল আমাকে বললেন, গাফ্‌ফার ভাই, আমাদের একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। আপনি বারো দিনের মতো অস্ট্রেলিয়ায় রইলেন, অথচ ওডারল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলাম না। ৮৩ বছরের এই বৃদ্ধ এখন পার্থ শহরের এক হাসপাতালে আছেন। তিনি হৃদরোগে ভুগছেন। অপারেশন হবে। বেঁচে উঠবেন কিনা জানি না।

বললাম, আমি জানলে পার্থ শহরে যেতাম। এখন দূরে বসে তাকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া কিছুই করতে পারি না।

কামরুল বললেন, আমি তার স্ত্রীকে আপনার কথা বলেছি। তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক ছিলেন। যা হোক, তা যখন হলো না, তখন আমি সিডনির একুশের বইমেলা সম্মেলনের নেহাল বারীকে বলব, আপনাকে ওডারল্যান্ড সম্পর্কে কিছু কাগজপত্র পাঠিয়ে দিতে।

কামরুল আহসান খানের অনুরোধ রেখেছে নেহাল বারী। তার সম্পর্কে কিছু কাগজপত্র আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। টেলিফোনে জানিয়েছে ওডারল্যান্ডের বর্তমান শারীরিক অবস্থা। তিনি এখন চোখে দেখেন না। বিভিন্ন রোগে তার শরীর এত দুর্বল যে ডাক্তাররা সেই শরীরে অস্ত্রোপচার করতে সময় নিচ্ছেন।

কেন জানি না, ওডারল্যান্ডের শারীরিক অসুস্থতা এবং আসন্ন অপারেশনের কথা জেনে আমার মনে দারুণ উদ্বেগ দেখা দিল। কদিন পরেই তার শারীরিক অবস্থা জানার জন্য ক্যানবেরায় কামরুলকে টেলিফোন করলাম। তাকে না পেয়ে সিডনিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদের ড. কাইউম পারভেজের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। পারভেজ সব খবরাখবর নিয়ে আমাকে জানাল, হাসপাতালে ওডারল্যান্ডের অপারেশন হয়ে গেছে। তিনি খুব ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে। খবরটা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি।

দেশের এবং বিদেশের কোনো কোনো কাগজে ওডারল্যান্ড সম্পর্কে যে সামান্য খবর বেরিয়েছে, তা পাঠ করেই আমার মনে হয়েছে, তিনি শুধু বীর নন, একজন কিংবদন্তির মানুষ। আমরা বাঙালিরা বড় হতভাগ্য জাতি। নইলে এমন একজন মানুষের জীবন নিয়ে কেন বাংলাদেশে গল্প, উপন্যাস, নাটক লেখা হয়নি? চলচ্চিত্র তৈরি হয়নি? মুল্‌ক রাজ আনন্দ যদি পারেন ডা. কোটেনিসের কাহিনী নিয়ে 'ডাক্তার কোটেনিস কা অমর কাহানী' নামে উপন্যাসোপম বই লিখতে, তাহলে ওডারল্যান্ডের অত্যাশ্চর্য জীবনকাহিনী-অন্তত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার অতুলনীয় ভূমিকা নিয়ে কেন মহত্তম যুদ্ধ-উপন্যাস তৈরি হলো না বাঙালি লেখকদের হাতে? আমার বিশ্বাস, এখনো লেখা হতে পারে। ওডারল্যান্ডের জীবন-কাহিনী জানতে পারলে সেলিনা হোসেন, হুমায়ূন আহমেদ, রশীদ হায়দার কিংবা ইমদাদুল হক মিলন এখনো পারেন বাস্তব জীবন-ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের এমন উপন্যাস লিখতে, যা সারা জাতির মর্মমূলে সাড়া জাগাতে পারবে।

ওডারল্যান্ডের শিক্ষাজীবন খুব বেশিদূর এগোয়নি। জীবিকার তাগিদে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি নেদারল্যান্ডের বাটা শূ কোম্পানিতে 'শূ-শাইনার' (জুতো-পরিষ্কারকারী) হিসেবে যোগ দেন। কিছুকাল রয়াল সিগনাল কোরের একজন সার্জেন্ট হিসেবেও কাজ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অধিকৃত নেদারল্যান্ডে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেন এবং ডাচ মুক্তিবাহিনীর কমান্ডো কোরের একজন কমান্ডার হন। তিনি প্রত্যক্ষ গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন এবং রেডিও টেকনিশিয়ান, গোলাবারুদ বিশেষজ্ঞ এবং গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় তার প্রেরণা ও আদর্শ ছিলেন সাবেক যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে নানা ধরনের পেশায় নিযুক্ত থাকার পর ওডারল্যান্ড আবার বাটা শূ কোম্পানির চাকরিতে ফিরে যান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ছমাস আগে ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে ঢাকায় বাটা শূ কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার হয়ে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ম্যানেজমেন্ট ডাইরেক্টরের পদে প্রমোশন পান। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ড দেখে চল্লিশের দশকের নাৎসি বর্বরতার কথা এবং তার গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেন, জীবন বাজি রেখে হলেও তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালের গেরিলা যুদ্ধে নিজের চমৎকার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি একাত্তরের বাংলায় একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বাটা শূ কোম্পানির পার্সোনেল ম্যানেজার কর্নেল নেওয়াজ ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বালুচ রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। ওডারল্যান্ড তাকে বাটা কোম্পানির কাজের অজুহাতে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। তিনি ঢাকায় এলে তার মাধ্যমে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড় বড় অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। কর্নেল নেওয়াজ তাকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যান। সেনা হেডকোয়ার্টারে তাকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে তার জন্য সেনা হেড কোয়ার্টারে অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। কর্নেল নেওয়াজের মাধ্যমেই তিনি জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল নিয়াজি ও রাও ফরমান আলী প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারবাহিনীর অনেক গোপন যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা তিনি সহজেই জানতে শুরু করেন এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাচার করতে থাকেন।

পাকিস্তানি সেনা অফিসাররা তাকে এতই বিশ্বাসভাজন মনে করেছিল যে, পঁচিশে মার্চের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার পর তাকে ২৪ ঘণ্টার জন্য কারফিউ-পাস, সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্সের গোপন পাস-যা দিয়ে সামরিক-অসামরিক যেকোনো গোপন জায়গায় অবাধে যাওয়া যায়-এবং যখন খুশি সেনা হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার পাস দেওয়া হয়েছিল। তিনি এর সাহায্যে হানাদার বাহিনীর বড় বড় গোপন তথ্য জানতেন এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করতেন। ঢাকায় অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার তখনকার দূতাবাস তার এই গোপন গোয়েন্দা তৎপরতায় কোনো বাধা তো দেয়ইনি, বরং নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা জুগিয়েছে। তার সকল কাজের সঙ্গী ও সহকর্মী ছিলেন বাটার পার্সোনেল ম্যানেজার এ কে এম আবদুল হাই। ওডারল্যান্ড মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য বাটা কোম্পানির তদানীন্তন কর্মকর্তা আবদুস সালাম, নূরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির খান, ডা. হাফিজুল ইসলাম ভুঁইয়া (কুসুম ডাক্তার), আমেরিকান নাগরিক মি. ট্রাকারকে নিয়ে একটি গোপন টিম গঠন করেছিলেন। তাদের মধ্যে হুমায়ুন কবির খান ও আবদুস সালামকে তিনি গেরিলা যুদ্ধে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার আগরতলায় পাঠান।

ওডারল্যান্ডের দুঃসাহসিকতার অন্ত ছিল না। তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানিদের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ পরিকল্পনা ও কৌশল জেনে তা দুনম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এ টি এম হায়দার, জেড ফোর্সের মেজর জিয়াউর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর (তখন কর্নেল) কাছে পাঠাতেন। এ কাজে তাকে সাহায্য জোগাতেন তার বাটা কোম্পানির সহকর্মী এ কে এম আবদুল হাই।

কেবল গোয়েন্দা তৎপরতায় লিপ্ত থেকেই ওডারল্যান্ড তার দায়িত্ব শেষ করেননি। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য টাকা, ওষুধপত্র, কাপড় এবং অস্ত্র সংগ্রহ করেছেন, এমনকি বাটা শূ কোম্পানির জুতো এবং কোম্পানির নিরাপত্তা রক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্রও মুক্তিযোদ্ধাদের দান করেছেন। নিজের ব্যক্তিগত পিস্তলটি বুলেটসহ যুদ্ধের কাজে দান করেছিলেন দুনম্বর সেক্টরের এক নম্বর প্লাটুন কমান্ডার এ কে এম জয়নুল আবেদীনকে। এই জয়নুল আবেদীনও পরে বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছিলেন।

ওডারল্যান্ডের সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজ ছিল বাঙালি মুক্তিফৌজের গেরিলা যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণে। তার নেতৃত্বে মুক্তিফৌজের কমান্ডো বাহিনী অতর্কিত হামলা চালিয়ে বহু পাওয়ার হাউজ ধ্বংস করেছে এবং হানাদার বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে ওডারল্যান্ড কেন অনুপ্রাণিত হলেন, সে সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়ার পর ১৯৯৭ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫নং পেট ক্রেসেন্ট ট্রিগ, পার্থ শহর থেকে লেখা এক চিঠিতে ঢাকায় ফ্রিডম ফাইটার্স কালচারাল কমান্ডের ঢাকা সিটি কমিটির মেম্বার-সেক্রেটারি আনোয়ার ফরিদিকে তিনি জানান, ÔHaving escaped from the POW camp after a short internment, I joined the Dutch underground resistance movement. As I spoke fluent German and several Dutch dialects, I befriended the German High Command and was thus able to help the Dutch underground movement as well as the Allied Forces with vital information. So when the events of March 1971 (in Bangladesh) started with tanks of the Pakistani forces rolling into Dhaka, I was reliving my experience of my younger days in Europe. I could fully appreciate and understand the predicament of the Bengali people and this motivated me to spring into action on their behalf... Deeply touched and moved by the almost unbearable suffering and atrocities I witnessed of the cruel and oppressive occupying force, I secretly began a guerilla movement with the brave Bengalees at Bata, Tongi and all around sectors 1 and 2'. (সংক্ষেপে : 'স্বল্পকালীন বন্দিদশার পর আমি যুদ্ধবন্দি শিবির থেকে পালাই এবং ডাচ আন্ডারগ্রাউন্ড রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্টে যোগ দেই। আমি খুব ভালো জার্মান এবং ডাচ ভাষার নানা উপভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারি বলে সহজেই জার্মান হাইকমান্ডের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলি এবং তাদের গোপন গুরুত্বপূর্ণ খবর ডাচ আন্ডারগ্রাউন্ড প্রতিরোধ কর্মীদের এবং মিত্রপক্ষকে জানাতে সক্ষম হই। ফলে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে যখন ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর ট্যাঙ্কের হামলা শুরু হয়, তখন ইউরোপে আমার তরুণ বয়সের অভিজ্ঞতাকে আমি কাজে লাগাতে পেরেছি। আমি বাঙালিদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেছিলাম। তাদের দুর্দশাই আমাকে তাদের পক্ষ হয়ে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে।... বাঙালিদের অসহ্য দুঃখ-কষ্ট এবং তাদের ওপর দখলদার অত্যাচারী বাহিনীর নিষ্ঠুরতা আমাকে অভিভূত করে ফেলে। আমি গোপনে টঙ্গীস্থ বাটা কোম্পানির সাহসী বাঙালি এবং সেক্টর ১ এবং ২-এর আশপাশের সাহসী মানুষের সহযোগিতায় গেরিলা মুভমেন্ট শুরু করি।)

ওডারল্যান্ড ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শিশুঘাতী নারীঘাতী বর্বরতার প্রচুর ছবি তুলেছিলেন, যা বিশ্ব বিবেককে জাগাতে সে সময় যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার এ অতুলনীয় অবদানের জন্যই তাকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সরকার বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে সে সময় তিনি এ পদক গ্রহণ করতে পারেননি। ১৯৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তার পক্ষ হয়ে এই পদক গ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধে তারই বীর সহচর এ কে এম আবদুল হাই। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে ক্যানবেরার বাংলাদেশ দূতাবাস এ পদক আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে দেন।

ওডারল্যান্ড এখনো জীবন্মৃত অবস্থায় রোগশয্যায় শুয়ে আছেন। কিন্তু তার কাহিনীর সঙ্গে আরো যে দুজনের কথা বলছি, তারা কেউ বেঁচে নেই। একজন লন্ডনের এক শাদা তরুণী, নাম মারিয়া প্রকোপে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অসম সাহসী বিদেশী নারী বার বার কখনো অর্থ, কখনো ওষুধ, কখনো গোপনে অস্ত্র নিয়ে মুক্তাঞ্চলে গেছেন এবং মুক্তিফৌজের হাতে তুলে দিয়েছেন। একবার হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েও তিনি বিদেশী হওয়ায় পালাতে সক্ষম হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত ঢাকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে এসেই আত্মহত্যা করে এমন সম্ভাবনাময় জীবনে ইতি টেনে দেন। তার এ মৃত্যু এখনো রহস্যের আবরণে ঢাকা। কেউ কেউ বলেন, এক বাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার গভীর প্রেম ছিল। ব্যবসায়ী নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিয়ে তাকে প্রতারিত করেছিলেন। মারিয়া বাংলাদেশে যাওয়ার পর তার কাছে এ প্রতারণা ধরা পড়ে। তিনি ভগ্নহৃদয়ে লন্ডনে ফিরে এসে আত্মহত্যা করেন। বাংলাদেশে বা লন্ডনে এই মারিয়া প্রকোপের কোনো স্মৃতি সংরক্ষিত হয়নি।

সব শেষে বলব মঙ্গল চৌধুরীর কথা। এক বিহারী যুবক। ১৯৭১ সালের জুন মাসে আমি যখন আগরতলায়, তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়। ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু স্বেচ্ছায় প্রতি সপ্তাহে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বাংলাদেশের ভেতরে যেতেন তাদের গোলাবারুদ, রসদ বহন করে। তার স্ত্রী তখন প্রথম সন্তানের মা হতে চলেছেন। মঙ্গল চৌধুরী গেরিলা তৎপরতায় যোগ দিতে রওনা হওয়ার আগে আগরতলা এম এল এ হাউসের আঙিনায় এসে আমাকে বলতেন, মি. চৌধুরী, আমার যদি কিছু হয়, আমার স্ত্রীকে খবরটা অন্তত পৌঁছাবেন।

আমি তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি বাঙালিদের এই যুদ্ধে নিজের জীবন স্বেচ্ছায় বিপন্ন করছেন কেন?

মঙ্গল চৌধুরী হেসে বলেছিলেন, এটা কেবল বাঙালিদের যুদ্ধ নয়। সারা ইনসানিয়াতের যুদ্ধ।

এই মঙ্গল চৌধুরী একদিন আর ফিরে আসেননি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে অসংখ্য বিদেশী নারী ও পুরুষ নানা ভূমিকায় অংশ নিয়েছেন, সাহায্য ও সমর্থন জুগিয়েছেন, ভারতের যে ২০ হাজার সৈন্য আত্মদান করেছেন, আমরা বাংলাদেশে তাদের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করিনি। তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা হয়নি। বাঙালি জাতি অকৃতজ্ঞ নয়-এই সত্যটিও আজ আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বিজয় দিবসের ইতিকথায় ওডারল্যান্ড, মারিয়া প্রকোপে এবং মঙ্গল চৌধুরীর মতো বিদেশী বীর ও বীরাঙ্গনাদের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে সংযোজিত হওয়া দরকার।

লন্ডন ॥ ১২ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ॥ ২০০০ ॥

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : লেখক ও সাংবাদিক।

নিজের স্বার্থেই পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত

আসমা জাহাঙ্গীর

__আসমা জাহাঙ্গীর__ পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারপারসন ও বিনাবিচারে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষ সমন্বয়ক। গত ৫ নভেম্বর দিল্লীতে আসমা জাহাঙ্গীরের এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন প্রথম আলো'র সম্পাদক __মতিউর রহমান__। একাত্তরে পাকবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ, এ সম্পর্কে সে দেশের সরকারের বর্তমান করণীয়, পাকিস্তানের চলমান রাজনীতিসহ নানা বিষয়ে তিনি খোলামেলা কথা বলেছেন এই একান্ত সাক্ষাৎকারে।

মতিউর রহমান : *ঢাকায় নিযুক্ত একজন পাকিস্তানি কূটনীতিক ইরফান রাজা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সম্প্রতি আপত্তিকর মন্তব্য করার পর এ ব্যাপারে আপনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিবৃতি দেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ।*

আসমা জাহাঙ্গীর : আমার কিন্তু মনে হয় না এ কারণে আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। আমি মনে করি এটা হলো বিবেকের তাড়না। আমি যে এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পেরেছি সেজন্য নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবান মনে হয়। আসলে চরম বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে হিসেব-নিকেশ করে ব্যাপক পরিসরে সংঘটিত যেকোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেই ধিক্কার জানানো উচিত। শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয়, গোটা বিশ্বের সব মানুষেরই উচিত এসব হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করা।

ম. র : *আমাদের মনে আছে, কয়েক মাস আগে হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর আপনি সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে '৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার দাবি করেছিলেন।*

আ. জা : আমি যা ভাবি সেটাই তো আমি বলব। অতীত ইতিহাসের প্রামাণ্য স্মৃতি আমি ধারণ করছি। '৭১ সালে বাংলাদেশে পাকবাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। প্রচার-প্রপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে মানুষ কী করে তার নিজের সৃষ্ট মিথ্যাচারই পরে বিশ্বাস করে ফেলে সেটা ভেবে আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই। একাত্তর ছিল ইতিহাসের তেমনই এক লগ্ন। আমি দেখেছি, পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা তখন সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে থাকে যে, তারা জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে দ০মন করতে পারবে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া নয়, যুদ্ধটাই তখন তাদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আমি মনে করি, সে সময়টাতে যে অল্প কজন লোক সত্যকথা বলছিলেন তাদের জন্য হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট একটা বড় অবলম্বন। সত্যকথা বলার খেসারত দিতে এই লোকগুলোকে জেলে যেতে হয়েছিল, সইতে হয়েছিল চরম ভোগান্তি। সত্যকথা বলায় এই লোকগুলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে হয়েছিলেন 'বেঈমান'। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট মারফত পাকিস্তানবাসী জানতে পেরেছে, সে সময় এই লোকগুলো কেবল সত্যকথাই বলেননি, কী ঘটতে চলেছে সে ব্যাপারে দূরদৃষ্টিও তাদের ছিল। সর্বনাশা কাজে বিশ্বাসী যারা তারা নয়, বরং ওই সত্যকথা বলা লোকগুলোই ছিলেন প্রকৃত নেতা।

ম. র : *অর্থাৎ, আপনি বলতে চান রিপোর্ট ছাপা হওয়ার আগেও পাকবাহিনীর নির্যাতন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে প্রতিবাদ উঠেছিল?*

আ. জা : নিশ্চয়ই। স্মরণ করে দেখুন, সেই মহৎ ব্যক্তি মাজহার আলী খান জেলে গিয়েছিলেন। সাংবাদিক আই এ রহমানকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছে নকীব হোসেনের ক্ষেত্রেও। আমার বাবা তখন আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন। তাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। কাজেই এ বিষয়টা নিয়ে আমি যা বলেছি তা নিজের মতো করে চিন্তা করেই বলেছি। আমি আমার বাবাকে বলেছি, আপনি ঠিক কাজটাই করেছিলেন। আপনার কাছে যা সত্য ও ন্যায় বলে মনে হয়েছে, অত্যন্ত কঠিন সময়েও তা আপনি জোর গলায় বলেছেন। আর, আপনার এই ন্যায়পরায়ণতার উত্তরাধিকার আপনি রেখে গেছেন আমার জন্য। আমার বাবা বেঁচে নেই।

ম. র : *আমরা জানতে পেরেছি যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, আপনার মতো ব্যক্তিত্ব ও মানবাধিকার সংগঠন '৭১ সালে সংঘটিত পাক বাহিনীর অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি করছে। এটা আমাদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক। একাত্তরের ভূমিকার জন্য পাকিস্তানি সরকার ক্ষমা চাক, এই দাবিতে আমাদের দেশেও আন্দোলন চলছে।*

আ. জা : আমি এ বিষয়ে আমার অবস্থান আরো স্পষ্ট করার জন্য বলতে চাই, আপনাদের কথা চিন্তা করে পাকিস্তানি সরকারের ক্ষমা চাওয়া উচিত সে কথা আমরা বলছি না। ক্ষমা চাওয়া উচিত আমাদের নিজেদের স্বার্থেই। আমরা যাতে আমাদের নিজেদের মতো করে থাকতে পারি সেজন্যই ক্ষমা চাইতে হবে। আর বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও যুদ্ধাহত নারী-পুরুষ এবং তাদের পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করে আমাদের দাবি হচ্ছে, এই অপরাধ যারা করেছে তাদের অবশ্যই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। অতীত কলঙ্কের এই ভার আমাদের নিজেদের মতো করে থাকতে দিচ্ছে না, এ থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া দরকার। আর সে কারণেই ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে আমাদের কাছে পাকিস্তান সরকারের বাধ্যবাধ্যকতা।

ম. র : *এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে পাকিস্তানের জনগণ ও প্রচার মাধ্যমের মনোভাব কেমন?*

আ. জা : ঠিক এ মুহূর্তে পাকিস্তান এক ছোটখাটো সংকটকাল অতিক্রম করছে। তাই জনমনে গভীর হতাশা। কাজেই পাকিস্তানে এগুলো আদৌ কোনো ইস্যু নয়। অবশ্য পাকিস্তানে দুটো চরমপন্থী ধারা রয়েছে যার অনুসারীরা বাস করছে পাশাপাশি। আর আমি এতে সন্তুষ্ট যে, একটি ধারার অনুসারীরা আমাদের মতোই মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে যাবে। পাশাপাশি পাকিস্তানে আরেকটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা মনে করে ক্ষমা চাওয়াটা মোটেও জরুরি নয়। ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে যারা কথা বলে তারা এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কাছে হয়ে যায় বেঈমান। কাজেই পাকিস্তানে এখন এই দুটো শক্তিই সক্রিয় রয়েছে এবং বাদবাকিরা নীরব দর্শক মাত্র।

ম. র : *এবার রাজনীতি প্রসঙ্গে আসা যাক। জেনারেল মোশাররফ ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলুন?*

আ. জা : গণতন্ত্রের পটপরিবর্তন পাকিস্তানের অনেক ক্ষতি করেছে। কেননা, আমাদের এখন কোনো দিকনির্দেশনা নেই। আর আপনি যখন কোনো পদ্ধতির ব্যাত্যয় ঘটাবেন তখন আসলে আপনি সেটির পূর্বাবস্থায় না আসাটাই নিশ্চিত করছেন মাত্র, তা ওই পদ্ধতি যতই নড়বড়ে হোক না কেন। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঠিক এ ঘটনাই ঘটেছে। আমরা পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো পথ দেখছি না। রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজছি। আমরা সব সময় বিশ্বাস করেছি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা আমাদের করতে হবে নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এটা স্রেফ ক্ষুদ্র একটা পদক্ষেপ মাত্র। আমরা এই ক্ষুদ্র পদক্ষেপ নিয়েছিলাম একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর ছত্রছায়ায়। এখন ওই একটি মাত্র ধাপও উপড়ে ফেলা হয়েছে।

কাজেই এখন আমরা কোথা থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু করব, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। আপনি জানেন, কোনো আত্মমর্যাদাশীল সমাজই রাজনৈতিক দল ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

আমরা এ কথা ভেবেও উদ্বিগ্ন যে, যথাযথভাবে দেশ শাসন করার দক্ষতা সামরিক বাহিনীর নেই, যা কিনা এ মুহূর্তে অতীব প্রয়োজন। এটা স্নায়ুযুদ্ধের সময় নয় যে সামরিক সরকারগুলোকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেওয়া হবে। আগে জনমনে এমন একটা ধারণা ছিল, সামরিক সরকার মানেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নির্বিঘ্ন থাকা এবং সেই সঙ্গে দেশের সমৃদ্ধি। কিন্তু এবার সামরিক শাসনের সময় তেমনটা হচ্ছে না বলে লোকে দেখছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ, অর্থনৈতিকভাবেও আমরা ভোগান্তির শিকার। এই প্রথমবারের মতো লোকজন সামরিক সরকারের সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক খুঁজতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা অবশ্য দূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের জন্যই মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু স্বল্প মেয়াদের কথা চিন্তা করলে বলা যায়, আমাদের খুবই নড়বড়ে ও হতাশাজনক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হতে পারে। এরপর হয়তোবা আমরা এমন একটা প্লাটফর্মে দাঁড়াতে পারব যেখানে আমরা আমাদের লক্ষ্যের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারব।

ম. র : *এসবের জন্য তো আপনি রাজনীতিবিদ অর্থাৎ জনগণ নির্বাচিত পরপর দুটো সরকারকে দায়ী করবেন? তারা সামান্যতম গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে অথবা জনগণের মঙ্গল সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছেন?*

আ. জা : আমি কাউকে আলাদাভাবে দায়ী করছি না। আমি আমাদের নিজেদেরকেই দায়ী করছি, কেননা আমরাই এত কিছু হতে দিয়েছি। ভেবে দেখুন, আমাদের দেশে কোনো অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিবিদ নেই। কিন্তু যে দেশ তার ইতিহাসের অর্ধেকের বেশি সময় ধরে সামরিক শাসনের অধীনে রয়েছে সেখানে এই পরিস্থিতির মধ্য থেকে কীভাবে প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে? দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন নেলসন ম্যান্ডেলা রয়েছেন। কিন্তু ম্যান্ডেলারা তো প্রতিদিন জন্মান না। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো সৌভাগ্য আমাদের নেই। তবে আপনি যদি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের রাজনীতিবিদদের সঙ্গেই আমাদের রাজনীতিকদের তুলনা করেন তাহলে দেখবেন পাকিস্তানি রাজনীতিকরা অন্যদের চেয়ে ভালোও নন, আবার খারাপও নন।

যা হোক, একটা বিষয় কিন্তু বেশ মজার। আমাদের দেশে এমন একটা প্রচারণা আছে যে, সব রাজনীতিকই দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবেন, প্রথম দিককার কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ নেই। লিয়াকত আলী খান, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ আলী (বগুড়া), চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, আই আই চন্দ্রীগড়, ফিরোজ খান নুন-এদের কারো বিরুদ্ধেই টাকা-পয়সা সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ নেই। তাহলে দুর্নীতির সূত্রপাত কখন থেকে হলো? সেনাবাহিনীই দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। অসাধু কাজ-কারবার শুরু করেছিল সেনাবাহিনীই। আর নওয়াজ শরিফ যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েই থাকেন, তা তিনি শিখেছেন তার মুরুব্বিদের কাছ থেকে। কাজেই সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত লোক হচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেলরা। হ্যাঁ, দুর্নীতিপরায়ণ কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদও রয়েছে। কিন্তু হাবিব জালিসও একজন রাজনীতিক ছিলেন। ৪ ফুট বাই ৬ ফুট একটা ঘরে তিনি মারা গিয়েছিলেন। এমনকি আমার বাবাও একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন যিনি মৃত্যুর আগে স্রেফ একটা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি। অথচ তার জন্ম হয়েছিল আরো অবস্থাসম্পন্ন পরিবারে। আই এ রহমানও রাজনীতিতে আছেন। তিনি খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করেন। তিনি আমার জানা সবচেয়ে সৎ মানুষ। কাজেই লোকে তাহলে দুর্নীতির কথা বলার সময় কোন রাজনীতিকদের কথা বলে? তারা গুটিকয়েক দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকের কথা বলে। এরা দুর্নীতিপরায়ণ সেটা অস্বীকার করার জো নেই। কিন্তু সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করানো যায় না।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানে কোনো বেসামরিক সরকারই ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। আর এর মূল্য তিনি দিয়েছেন ফাঁসিতে ঝুলে। অর্থাৎ আমরা কখনই সত্যিকার বেসামরিক সরকার পাইনি। আমরা এমন কিছু লোক পেয়েছিলাম, যারা দেশ শাসন করেছেন সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবাধীনে।

ম. র : *পাকিস্তানে ক্ষমতায় আবার আসীন রয়েছে সেনাবাহিনী এবং আরো কিছু সময় তারা দেশ শাসন করবে বলে বোঝা যাচ্ছে। আমরাও এক সময় পাকিস্তানের অংশ ছিলাম, অনুরূপ অভিজ্ঞতা আমাদেরও আছে। আমাদেরও সামরিক সরকার ছিল। যদিও এখন আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেকারত্ব, নারী নির্যাতন-এসব আমরাও মোকাবিলা করছি। আসলে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ কোথায়? পাকিস্তানে যা হচ্ছে তা থেকে বাংলাদেশ কী অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে?*

আ জা : আমার তো ইচ্ছে করে আমাদের দেশে ভালো কিছুর চর্চা হোক এবং তা আমরা আপনাদের দেশেও সঞ্চার করতে পারি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা তো অন্য রকমের।

আমি লক্ষ করেছি, কার্যকরী স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার সহায়তা ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই টিকে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের জন্য যা সত্যি প্রয়োজন

তা হলো, বেশি বেশি গণতন্ত্র, কম কম নয়। এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ সংঘাতের রাজনীতি বা মেরুকরণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। তখন একটা তৃতীয় শক্তির উত্থান ঘটবে। কিন্তু জনগণকে ধৈর্য ধরতে হবে। কারণ এটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সহজ কিন্তু তা টিকিয়ে রাখা কঠিন।

ম. র. : *এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে আমাদের মেলা সময় লাগছে। ক্ষমতার শীর্ষে আমরা কাদের দেখছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি সেখানে ভালো লোকদের না পাই তাহলে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখা কঠিন।*

আ. জা. : হ্যাঁ, ভালো লোক কাজটা সহজতর করতে পারে। খারাপ, অদক্ষ, অকার্যকর, দুর্নীতিপরায়ণ লোক সমাজে বড় ধরনের হতাশা ডেকে আনতে পারে। আর এখানেই যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত। আমি আপনাদের সমস্যা অনুধাবন করি। এখানে গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল। গণতন্ত্র খুব শক্তভাবে শেকড় গাঁড়তে পারছে না। এমন নয় যে, জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক নয়। এই ব্যর্থতার জন্য মূলত দায়ী রাজনীতিকদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব।

আমরা বুঝতে পেরেছি এবং আমি মনে করি, আমাদের নেতৃবৃন্দও ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যে, রাজনীতিতে প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ম. র : *সহনশীলতাও খুব জরুরি।*

আ. জা. : হ্যাঁ, সহনশীলতা। আসলে আমি মনে করি, নব্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলও উল্লেখযোগ্য। তারাও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। আর সরকার যদি তাদের সঙ্গে মানিয়ে না চলে, তাহলে পরে দেখা যাবে সরকার তার নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করছে। কারণ জনগণ ব্যাপারটা বেশি দিন সহ্য করতে পারবে না।

ম. র. : *পাকিস্তানে জে. মোশাররফ কীভাবে ক্ষমতা সংগঠিত করতে যাচ্ছেন? তিনি কীভাবে তার রাজনৈতিক ভিত তৈরি করছেন? তিনি কি কোনো নতুন দল গঠন করবেন? এ ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা আছে?*

আ. জা. : আমি শুধু বিষয়টা বিশ্লেষণ করতে পারি। অবশ্য আমার সঙ্গে সরকারের কোনো সম্বন্ধ নেই। তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমেই কেবল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই সামরিক সরকার তার পূর্বপুরুষদের পথই অনুসরণ করছে। তারা কোনো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচন করবে। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকায় এই নির্বাচন হবে নিয়ন্ত্রিত। সামরিক বাহিনী তাদের ক্ষমতা সংগঠিত করবে ধাপে ধাপে। তারা সেনা সদর সুদৃঢ় করার জন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নতুন মুখ, নতুন নেতৃত্ব পাবে। আর এভাবেই তারা ধাপে ধাপে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ক্ষমতা সংগঠিত করবে। এই পদ্ধতি অন্য সামরিক সরকারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভালো কাজ দিতে পারে। কিন্তু এ যাত্রা তা কাজে আসবে কিনা সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, এবার তারা সংবিধান পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গঠনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। আপনার যদি সেনাবাহিনী আর অস্ত্র থাকে তাহলে তাদের কাজে লাগিয়ে আপনি যেকোনো কিছু করতে পারেন। কিন্তু সামরিক সরকার অবশ্যই নাগরিক সমাজ তথা জনগণের সহযোগিতা পাবে না। জনগণ শুধু তীব্র অসন্তোষ নিয়ে কী ঘটছে তা দেখছে।

ম. র. : *পত্রপত্রিকায় আমরা পড়েছি, পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দল একজোট হচ্ছে। তাদের আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে আপনি মনে করেন?*

আ. জা. : আমি মনে করি এটা ইতিবাচক ঘটনা। কেননা, তারা অন্তত একসুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছে, আমরা কখনই সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় ডেকে আনব না, যেমনটা হয়েছে অতীতে। দ্বিতীয়ত, আমরা এই ঐক্যজোটের ওপর এ ব্যাপারে জনমতের চাপ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করছি যে, তাদের এবার অবশ্যই একটা আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। তাদের ন্যূনতম একটা এজেন্ডায় একমত হতে হবে যাতে যদি তারা কখনো ক্ষমতায় ফিরে আসে তখন যেন আমাদের অতীতের মতো বাধা-বিঘ্ন না পেরুতে হয়। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে আমারা একটা বৈঠকের আয়োজন করতে যাচ্ছি, যেখানে কয়েকটি বিষয় উত্থাপন করা হবে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে পরিবর্তনের সূচনা করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই উত্থাপিত বিষয়গুলো গ্রহণ করার জন্য ঐকজোটের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে।

ম. র. : *শেষ প্রশ্ন; দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক তাত্ত্বিক মার্কিন লেখক স্টিফেন কোহেনের একটি লেখা পড়েছি। তাতে তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার একটা সমাধান আছে। তা হলো, সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে এক ধরনের কোয়ালিশন বা সমঝোতা। আপনি কি এই কথার সঙ্গে একমত পোষণ করেন?*

আ. জা. : আমার মনে হয়, কোহেন সাহেবের উচিত তার নিজ দেশের সরকারকেই এমন পরামর্শ দেওয়া। বিশুদ্ধ গণতন্ত্র যে শুধু আমেরিকাতেই থাকবে, পাকিস্তানে থাকবে না, সেটা তো হয় না। গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করা আমেরিকানদের কাছে যেমন কাঙ্ক্ষিত, আমাদের কাছেও সমান কাঙ্ক্ষিত।

ম. র. *: বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য কিছু বলবেন।*

আ. জা. : আমার কাছে জাতি বা জাতীয়তা মুখ্য বিষয় নয়; আমার কাছে জনগণই মুখ্য। আমরা পাকিস্তানিরা খুব অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলাম বলেই পূর্ব পাকিস্তান হারিয়েছিলাম। পূর্ব পাকিস্তান থেকে তখন আমাদের দিকে ধর্মনিরপেক্ষতার হাওয়া বইছিল এবং আমাদের বন্ধ জানালা একটু একটু করে খুলে যাচ্ছিল, তাতে আমরা কিছু মানুষ প্রাণভরে নিশ্বাস নিচ্ছিলাম। কিন্তু তারা সেটা বন্ধ করে দিল। আমি এ কথাই বলব।

ম. র. : *আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।*

আ. জা. : আপনাকেও ধন্যবাদ।